বাতায়ন

বুদ্ধের সন্ধানে কয়েকজন বিদেশি

কুণাল চট্টোপাধ্যায়

১৮১৮-র সেপ্টেম্বর থেকে ১৮১৯-এর সেপ্টেম্বর—এই এক বছরে ইংল্যান্ড থেকে তিনজন তরুণ চাকরি নিয়ে ভারতের মাটিতে পদার্পণ করেছিলেন—জর্জ টার্নার (১৭৯৯-১৮৪৩), ব্রায়ান হজসন (১৮০০-১৮৯৪) এবং জেমস প্রিন্সেপ (১৭৯৯-১৮৪০)। এঁরা এই উপমহাদেশের তিন প্রান্তে প্রেরিত হন। টার্নার যান শ্রীলঙ্কায়, হজসন হিমালয়ে, প্রিন্সেপ কলকাতায়।

টার্নার শ্রীলঙ্কাতেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনিই প্রথম ব্রিটিশ যাঁর জন্ম দেশের বাইরে কোনও ব্রিটিশ উপনিবেশে, এমনটি ভাবা হয়ে থাকে। প্রথম পাঁচ-ছয় বছর সিংহলে কাটানোর পর তাঁকে ইংল্যান্ডে শিক্ষালাভের জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। পরবর্তী কালে নিজের প্রবল ইচ্ছাতেই তাঁর পুনরায় ওই দ্বীপে আসা।

টার্নার যখন শ্রীলঙ্কায় যান তখন সেই দ্বীপরাষ্ট্রে ব্রিটিশ শাসন পাকাপোক্তভাবে কায়েম হয়েছে। ক্যান্ডির হিন্দু রাজা শ্রীবিক্রমসিংহকে পরাভূত করে সেখানে তখন আছেন ড. জন ডেভি—বিজ্ঞানী স্যার হামফ্রে ডেভির সহোদর। হিন্দু রাজা সম্পূর্ণ পরাস্ত হন 'ডালাডা মালাগাওয়া' ইংরেজদের হস্তগত হওয়ার পর। সেখানকার বিখ্যাত বুদ্ধদন্তের স্থানীয় নাম ডালাডা মালাগাওয়া, যাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে বিশ্ববিখ্যাত টুথ টেম্পল। মণিমুক্তো-খচিত নানান মাপের ছয়টি স্বর্ণপেটিকার মধ্যে ক্ষুদ্রতম বাক্সটিতে রাখা অমূল্য, বৌদ্ধধর্মের পবিত্রতম বস্তুটি ড. ডেভি দু-তিন ফুট দূর থেকে দেখেছিলেন। একমাত্র প্রধান পুরোহিতই সেটি স্পর্শ করার অধিকারী। প্রায় ৩.৭ সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্য ও ০.৯ সেন্টিমিটার পরিধির লম্বা বাঁকানো শিকড়বিশিষ্ট বিবর্ণ বাদামী বস্তুটিকে ভিতর দিকের কষের দাঁত মনে হলেও, ডেভির সেটিকে হাতির দাঁতে নির্মিত বলে মনে হয়েছিল।

১৮২০-র মাঝামাঝি টার্নার রত্নপুরাতে কালেক্টর

প্রাক্তন অধ্যাপক ও গবেষক, অর্থনীতি, হেরিটেজ ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি

এবং ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে যোগ দেন। বিখ্যাত আদম শিখরের পশ্চিমাঞ্চলে সুন্দর পরিবেশে তিনি থাকতেন। ধীরে ধীরে স্থানীয় বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের আস্থা অর্জন করেন তিনি, এক ভিক্ষু তাঁকে পালি ভাষা শেখাতে রাজি হন। একদিন টার্নারকে মূল্যবান 'মহাবংশে'র এক পাণ্ডুলিপি এনে দেন সেই ভিক্ষু। দুজনে মিলে ওই অমূল্য পাণ্ডুলিপির মর্মোদ্ধার করতে গিয়ে টার্নার আবিষ্কার করেন, সেটি কেবল বৌদ্ধধর্মের আগমনকাল থেকে দেশটির ধারাবাহিক ইতিহাসই নয়, বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসও। এতদিন তিনি ভাবতেন সিংহলীদের কোনও লিখিত ইতিহাস নেই। টার্নার রাজধানী ক্যান্ডিতে এসে পালি থেকে মহাবংশের ইংরেজি অনুবাদ করেন। তাঁর এগারো বছর সিংহলে অবস্থানকালের সেরা অবদান পালিচর্চাকে নতুন মাত্রায় উন্নীত করা।

১৮৪১ সালে টার্নারের স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটলে তিনি অবসর নিয়ে দেশে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু অতিরিক্ত ঠান্ডা সহ্য করতে না পারার জন্য তিনি ইতালির নেপলস্-এ পাকাপাকিভাবে থাকার সিদ্ধান্ত নেন। অবশেষে ১৮৪৩-এর এপ্রিলে মাত্র তেতাল্লিশ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। মহাবংশ অনুবাদ তখনও অসম্পূর্ণ।

টার্নার যখন সিংহলে পালিচর্চা করছেন তখন এই উপমহাদেশের উত্তরতম প্রান্তে ব্রায়ান হটন হজসন খুঁজে পাচ্ছেন তাঁর মনীষা বিকাশের বৃহত্তম ক্ষেত্রকে। ১৮১৫-র নেপাল যুদ্ধের পর নেপাল তখন ব্রিটিশের হস্তগত। নিজের দেশে হেলিবুরিতে ও কলকাতার ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে প্রশিক্ষণ শেষে হজসন ১৮২০ থেকে ১৮২৩ পর্যন্ত অন্তত দুশো আঠারোটি সংস্কৃত পুঁথি কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটিতে পাঠিয়েছিলেন। সোসাইটির প্রধান ড. উইলসন সেগুলির প্রাপ্তি স্বীকার করলেও গুরুত্ব দেননি। তারপরও হজসন আরও কিছু পুঁথি দান করলেন যার মধ্যে ছিল তিব্বতি বৌদ্ধসূত্রের এক অখণ্ড সংস্করণ। প্রত্যাশিত মর্যাদা না পেয়ে তিনি বিরাট সংখ্যক সংস্কৃত পুঁথির তৃতীয় সম্ভার পারির College de France-এ সম্পূর্ণ নিজের খরচে পাঠিয়ে দেন। ফরাসি সরকার তাঁকে স্বর্ণপদক সহ সর্বোচ্চ সম্মান লিজিয়ঁ দ্য অনারে (Legion d'honneur) ভূষিত করে।

এই সময় তাঁর সঙ্গে পাটনার অমৃতানন্দ বন্দ্যো (পাধ্যায়?) নামে এক বৌদ্ধ পণ্ডিতের সখ্য স্থাপিত হয়, যিনি ছিলেন সেই সময়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৌদ্ধ শাস্ত্রজ্ঞ। হজসন নেপালের ব্রিটিশ রেসিডেন্সির অনুমতিক্রমে তাঁকে নিয়ে নেপালি ও তিব্বতি লামাদের বুদ্ধভাবনার পার্থক্য সংক্রান্ত একাধিক সাহিত্য রচনা করেন।

একইসময়ে ব্রিটিশ চিকিৎসকদ্বয় উইলিয়াম মুরক্রোফট এবং জেমস জেরার্ড কাশ্মীর হিমালয় আবিষ্কারে রত ছিলেন। জর্জ ট্রেবেকের সঙ্গে যৌথ প্রকাশনায় মুরক্রোফটের লাদাখ ও কাশ্মীর সংক্রান্ত প্রতিবেদনটি সেইসময়কার সামাজিক ইতিহাসের এক মূল্যবান দলিল হিসেবে বিবেচিত হয়।

১৮২২ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে লে থেকে ড. মুরক্রোফট লিখেছিলেন, তিনি পরিচিত হয়েছেন 'a most extraordinary traveller'-এর সঙ্গে— হাঙ্গেরির Alexander Cossma de Koros. তিন বছর ধরে এই যুবক মধ্য এশিয়া চষে বেড়াচ্ছেন। ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দে ট্রানসিলভেনিয়ায় জন্মগ্রহণ করা এই মানুষটির মধ্যে এক সৃষ্টিছাড়া প্রতিভার লক্ষণ ছিল।

কসমা দ্য করোসির মনে অল্প বয়স থেকেই এক বদ্ধমূল ধারণা ছিল যে তাঁর সময়ে অত্যাচারিত হাঙ্গেরিয়রা আদতে অ্যাটিলা দ্য হুনের বংশধর, যাদের আদিনিবাস পামিরের পূর্বাঞ্চলে। এই বিশ্বাস নিয়েই তিনি ভাষার শিকড়কে অবলম্বন করে মধ্য এশিয়ার পথে যাত্রা করেন। একে একে

আলেকজান্দ্রিয়া, আলেপ্পো, বোখারা, কাবুল এবং শ্রীনগর হয়ে তিনি লে-তে পৌঁছন। তাঁর চিন্তায় তখন কেবলই তিব্বত ও তার ভাষা। মুরক্রোফটের মনে হয়েছিল এই তরুণ গবেষকটিকে বেঙ্গল গভর্নমেন্টের অর্থসাহায্য করা উচিত। তাই তিনি এই গবেষককে কিছু অর্থ ও বই দেন। এর আড়াই বছর পর ক্যাপটেন কেনেডি করোসির থেকে একটি চিঠি পান : ''মুরক্রোফটের সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পর তিব্বত সম্পর্কে আমার আগ্রহ বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এখানকার প্রতিটি মনাস্টারিই অসংখ্য আগ্রহোদ্দীপক সাহিত্যসম্ভারে ঠাসা। এই উদ্দেশ্যেই জান্সকারের এক প্রবীণ লামার মূল্যবান সান্নিধ্যে এসে আমি তিব্বতি ব্যাকরণ ও ভাষা সম্পর্কে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছি।'' ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এবং মুরক্রোফটের ঋণ তিনি শোধ করতে চাইলেন তাঁর গবেষণার ফসল কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটিকে দান করে। সোসাইটি তাঁকে নিরাশ করেনি, মাসিক পঞ্চাশ টাকা স্টাইপেন্ডে নিয়োগ করেছিল।

১৮২৭ সালে ড. জেমস জেরার্ড জান্সকারে করোসির সঙ্গে দেখা করেন। জেরার্ড তখন গুটিবসন্ত দূরীকরণের কাজে ব্যস্ত ছিলেন। তাঁর লেখা থেকে জানা যায় তিব্বতি ব্যাকরণ ও তিব্বতি ইংরেজি অনুবাদের কাজে করোসি প্রাচীন যুগের গ্রিক দার্শনিকের মতো একান্তে সৃষ্টিসুখে মেতে ছিলেন। প্রাণঘাতী ঠান্ডায় বায়ু চলাচলের সুযোগহীন কুঠুরিতে, অনুপযোগী বস্ত্রাচ্ছাদিত হয়ে কেবল চা ও অনুরূপ পানীয়-নির্ভর দিন কাটাচ্ছিলেন আবিষ্কারের আনন্দে। অনুবাদকর্ম ব্যতীত কোনও প্রয়োজনই তাঁকে আকর্ষণ করত না।

হজসনের মতো করোসির কাজেও উইলসন তেমন উৎসাহ দেখাননি। ইতোমধ্যে করোসি কাঠমাণ্ডুতে হজসনের সঙ্গে যোগাযোগ করে ফেলেছেন। শিকারি ঈগলের মতো হিমালয়ের দু-প্রান্তে বাসা বেঁধেছেন দুজন। একজন বুদ্ধসংক্রান্ত বিশাল সংস্কৃত পুঁথি নিয়ে নেপালে, অন্যজন বুদ্ধের তিব্বতি উৎসের ভাণ্ডার সহ লাদাখে। বুদ্ধের সন্ধানে একে অপরের পরিপূরক হয়ে উঠলেন তাঁরা, দুই যন্ত্রশিল্পীর যুগলবন্দির মতো।

দুই পণ্ডিতের দ্বৈত সারস্বত অনুসন্ধান জানাল, তিব্বতি লিপি ও ভাষার অন্যতম ধাত্রী হল সংস্কৃত। সপ্তম শতাব্দীতে অসংখ্য তিব্বতি দিনের পর দিন ভারতে থেকে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করতেন। ভারতীয় পণ্ডিতরাও নিয়ম করে তিব্বতে যেতেন। গৌতমবুদ্ধের মহানির্বাণের পর তিনটি পর্যায়ে এই ধর্ম তিব্বতকে প্লাবিত করে—প্রথমটি বুদ্ধের প্রয়াণের পরে পরেই, দ্বিতীয় ধারাটি সম্রাট অশোকের সময় ও তৃতীয় পর্যায়টি হল কণিষ্কের শাসনকালে একাদশ শতকের শুরুতে, যখন মূল ভারত ভূখণ্ডে বৌদ্ধধর্ম অস্তমিত হয়েছে।

তিন বছর পর করোসি কলকাতা আসতে চাইলে এশিয়াটিক সোসাইটির প্রধান উইলসন ভারততত্ত্বে নিবেদিতপ্রাণ এই মনীষীকে না চিনলেও কোম্পানির কর্তারা ভুল করেননি। ১৮৩১-এর মে মাসে বরফের রাজ্য থেকে ইংরেজদের বর্ণনায় 'বেকিং সামারে' কলকাতায় পদার্পণ করলেন ঋষি করোসি। সঙ্গে তাঁর কয়েক শকট পুঁথি, পাণ্ডুলিপি। হজসনের পাঠানো পুঁথি পাণ্ডুলিপি তখনও সোসাইটির গ্রন্থাগারে রক্ষিত এবং অপঠিত। সোসাইটির কোষাধ্যক্ষ বাবুরাম সেন তাঁর বাসগৃহ খুলে দিলেন জ্ঞানতপস্বী করোসির অবস্থানের জন্য।

তাঁর তিব্বতি ব্যাকরণ ও তিব্বতি-ইংরেজি অভিধান তখন প্রায় সম্পূর্ণ ও ছাপা অক্ষরে প্রকাশের অপেক্ষায়। কিন্তু কোম্পানি এই ছাপার ব্যয়ভার বহনে যখন দোলাচলে ঠিক তখনই সেটি ভিক্টর শানমান্ট (Victor Jacquemont) নামের এক ফরাসি পর্যটকের হাতে পড়ে। শানমান্ট এটি পড়ে জানান, বৌদ্ধধর্মের মহাযান শাখা

(Vajrayana) এখানে পল্লবিত হয়েছে যার অনেকটাই একঘেয়ে, উদ্ভট, অর্থহীন বিষয় ও প্রথাকে গুরুত্ব দিয়েছে। ফলে ছাপানোর বিষয়টি আলোচনার স্তরে থেকে গেল বেশ কিছুদিন।

পরের বছর, ১৮৩২ খ্রিস্টাব্দে ডঃ উইলসন এশিয়াটিক সোসাইটির সম্পাদক পদ থেকে অবসর নেন। করোসির তিব্বতি ব্যাকরণ ও অভিধান বই দুটির পাণ্ডুলিপি ইংল্যান্ড থেকে প্রকাশিত হওয়া উচিত বলে তিনি সঙ্গে করে নিয়ে যেতে চাইলে কোম্পানির কর্তারা তা নাকচ করে এই অভিমত দেন যে, এগুলি কলকাতা থেকেই প্রকাশিত হওয়া উচিত। তার জন্য যত খরচই হোক না কেন তা পুস্তক দুটির গুণগত মানের তুলনায় সামান্য।

১৮৩৫-এর নভেম্বরে করোসি শিলিগুড়ি অভিমুখে যাত্রা করেন। সিকিমপুত্তি রাজা তখন দ্য দুর্জয়লিঙ্গ (দার্জিলিং) গ্রাম সমেত শিলিগুড়ির তরাই ইংরেজকে দিয়েছেন। ব্রিটিশ কর্মচারীদের স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য দার্জিলিং-এ স্যানাটোরিয়াম গড়ে তুলছেন ড. ক্যাম্পবেল। করোসির ইচ্ছে সিকিমের ভিতর দিয়ে তিব্বত যাওয়ার। মেজর লয়েড চেয়েছিলেন তাঁকে লাসা পাঠাতে কিন্তু করোসি রাজি হলেন না। হজসন চেয়েছিলেন তাঁকে নেপালে নিয়ে যেতে কিন্তু নেপাল সরকার অনুমোদন না দেওয়ায় করোসি দীর্ঘ দু-বছর শিলিগুড়িতে বাংলা ও সংস্কৃত শিক্ষায় নিজেকে ব্যস্ত রাখলেন। তারপর কলকাতায় ফিরে এলে জেমস প্রিন্সেপ তাঁকে এশিয়াটিক সোসাইটির লাইব্রেরিয়ান পদে বহাল করেন।

একস্থানে দীর্ঘদিন অবস্থান করোসির স্বভাববিরুদ্ধ। ১৮৪২-এর ফেব্রুয়ারিতে সোসাইটির নতুন সম্পাদক টোরেন্সের কাছে তিনি মধ্য এশিয়া যাত্রার ইচ্ছা প্রকাশ করে চিঠি দিলেন। সেই চিঠি ইচ্ছাপত্রের সমগোত্রীয়। জানালেন, মৃত্যুর পর তিনি তাঁর সকল সম্পদ কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটিকে দান করতে চান। ফলে তাঁর পুনরায় শিলিগুড়ি যাত্রা। ভাবলে অবাক হতে হয়, যে-যুগে গুগ্‌ল নেই, মেক মাই ট্রিপ ওয়েবসাইট নেই, রেললাইন পাতার কাজ শুরুই হয়নি, সেই সময় কলকাতায় বসে মধ্য এশিয়া যাত্রার পরিকল্পনা করছেন এক গবেষক। 'Lunatic genius'-এর প্রকৃত দৃষ্টান্ত যেন। জানা যায়, যখনই করোসি কোথাও যেতেন, সঙ্গে যেত তাঁর দুই গরুর গাড়ি বই, পুঁথি, পাণ্ডুলিপি।

বাংলা ও বিহারের তরাই-এর গভীর বনাঞ্চল তখন ভয়াবহ ম্যালেরিয়ার স্বর্গরাজ্য। সেই কারণে দিনের বেলায় দ্রুত সেই অঞ্চল অতিক্রম করাই ছিল নিয়ম। কিন্তু করোসি তা করতে ব্যর্থ হয়ে জঙ্গলেই তাঁবু খাটিয়ে অস্থায়ী রাত্রিবাসে বাধ্য হন। পরদিন কার্শিয়াং-এ পতাকা, জলশক্তি চালিত প্রেয়ার হুইল, সাদা রঙের চোর্তেন, 'মণিপদ্মে হুম' খোদিত মনাস্টারি ও সেখানে মুণ্ডিতমস্তক লাল পোশাকের মানুষজন দেখে মনে তিব্বতি স্মৃতি ফিরে পান। সেখান থেকে দুদিনে তিনি দার্জিলিং পৌঁছন। সেখানকার স্যানাটেরিয়ামে ড. ক্যাম্পবেলের কাছে করোসির আসার আগাম খবর ছিল। দার্জিলিং পৌঁছনোর কদিনের মধ্যেই জ্বরে আক্রান্ত হলেন করোসি। কেবলমাত্র চা আর সামান্য সিদ্ধভাত ছিল আহার। ওষুধ তেমন খেতেন না। কিছুটা সুস্থ হয়ে ড. ক্যাম্পবেলকে তিনি উইঘুর যাত্রার আগ্রহ দেখান। তাঁর বিশ্বাস ছিল, এতদিন যে-জাতির সন্ধানে তিনি গবেষণারত তারা সেখানেই আছে। পরদিন (১১ এপ্রিল) তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। তখন তাঁর বয়স আটান্ন বছর।

প্রায় সারা জীবন তিব্বতি মহাযানী বৌদ্ধচর্চায় রত থাকলেও করোসি কখনই সেই ধর্মের অনুসারী ছিলেন না। বরং তিনি তিব্বতিদের বিশ্বাসকে খ্রিস্টধর্মের কাছাকাছি মনে করতেন, যার সঙ্গে কোনও এশীয় যোগ নেই। তিনি তাঁর এই একমুখী

নিষ্ঠা নিয়ে করে যাওয়া কাজকে 'Wild metaphysical speculation' বলে বর্ণনা করেছেন। তবু জাপান তাঁকে 'বোধিসত্ত্ব' বলে ঘোষণা করেছে। ১৯৩৩ সালে টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যান্ড হলে এই ঘোষণা করা হয়। পরবর্তী কালে সেদেশের ইম্পিরিয়াল মিউজিয়ামের সামনে করোসির পদ্মাসনে বসা ধ্যানমূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হয়। কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটিতেও এই ঋষিতুল্য মানুষটির এক প্রস্তরমূর্তি স্থাপিত হয়, যে-পাথরটি দান করেছিলেন বঙ্গরত্ন শিল্পপতি স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। আজও কোনও হাঙ্গেরীয় ভারত ভ্রমণে এলে করোসিকে স্মরণ করতে ভোলে না। গত আশির দশকে হাঙ্গেরির সদ্য নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট কলকাতায় এসে কার্শিয়াং গিয়েছিলেন করোসির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতে।

লেখার শুরুতেই যে তিনজনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তাঁদের তৃতীয়জন হলেন আমাদের কাছে সর্বাধিক পরিচিত ও বিবিধ গুণের অধিকারী জেমস প্রিন্সেপ। স্ট্র্যান্ড রোডে পার্থেনানের অনুকরণে নির্মিত নয়নাভিরাম ভবনে অবস্থিত কলকাতার পুরাতন মিন্টের সহকারী প্রধানের পদে তিনি যোগ দেন। প্রধান ছিলেন এশিয়াটিক সোসাইটির সম্পাদক ড. হোরেস হেম্যান উইলসন। কলকাতায় এসেই তিনি প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর ও রাজা রামমোহন রায়ের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার কথা বাবাকে চিঠিতে জানান।

এক বছরের মধ্যেই জেমসকে বেনারসের টাঁকশালের প্রধান করে পাঠানো হয়। গঙ্গাপথে ১৮১৯ সালের সেপ্টেম্বরে রওনা হয়ে নভেম্বরে তিনি বেনারস পৌঁছন। পুরো যাত্রাপথের বর্ণনা, বিশেষ করে রাজমহল পাহাড়ের সৌন্দর্যের কথাও তিনি বাবাকে লিখে জানিয়েছিলেন।

বেনারস পৌঁছেই তারুণ্যের মুগ্ধতায় তিনি লেখেন, 'A real town, exclusive and of store... The Ghats on the banks of the sacred Ganges are really superb. A few sketches will however do much more in the way of description than all I could say.' উল্লেখ্য, জেমস প্রিন্সেপরা ছিলেন সাত ভাই। তাঁরা সকলেই ছিলেন প্রতিষ্ঠিত চিত্রকর। তিন ভাই একই সময় ভারতে রাজকর্মচারী ছিলেন।

তাঁর বেনারসবাসের অভিজ্ঞতা থেকে জানা যায়, অনেক ভোরে উঠে তিন মাইল দূরে অফিসে গিয়ে কাজ সেরে তিনি গ্রীষ্মের সূর্য অসহনীয় হওয়ার আগেই দশটায় ঘরে ফিরে আসতেন। তারপর নিজের পরীক্ষাগারে নানান যন্ত্রপাতি আবিষ্কারে মেতে থাকতেন। আবিষ্কার করেছিলেন ফার্নেসের যথাযথ তাপমাত্রা নিরূপণকারী Pyrometer। ১৮২৮-এ তিনি রয়্যাল সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত হন। একইসঙ্গে তিনি বেনারসের প্রথম নিখুঁত মানচিত্র নির্মাণে নিজেকে ব্যস্ত রাখেন।

মানচিত্র নির্মাণের পর তাঁর উল্লেখ করার মতো দ্বিতীয় প্রকল্পটি ছিল শহরে ম্যালেরিয়ার আঁতুড়ঘর একাধিক স্থানে জমা জলকে নিকাশির সাহায্যে নিঃসৃত করা। তাঁর ভাই বলেছেন, দীর্ঘ নলের সাহায্যে এই নিষ্কাশন ব্যবস্থায় সফল হওয়ার পর জেমস স্থানীয় মানুষজনের কাছে বীরের সম্মান লাভ করেন। এরপর তাঁর কীর্তি—গঙ্গাতীরে আওরঙ্গজেব নির্মিত বিপজ্জনকভাবে ঝুঁকে পড়া মসজিদটি ভেঙে পুনর্নির্মাণ। এছাড়া যে-বিশাল কর্মযজ্ঞে তিনি নিজেকে যুক্ত করেন সেটি হল নদীর উপর সেতু নির্মাণ।

১৮২৮ সালে বেনারস মিন্ট বন্ধ হলে জেমস কলকাতা মিন্টের দায়িত্ব নিয়ে চলে আসেন। ১৮৩০-এর দশকে একের পর এক দুর্ভাগ্যের শিকার হন তিনি। তার মধ্যে পামার অ্যান্ড কোম্পানির দেউলিয়া হওয়া থেকে ভাইয়ের মৃত্যু

অন্যতম। তাঁর ছোট ভাই টমাস পূর্ব কলকাতার লবণহ্রদ অঞ্চলে নালা নির্মাণে নিযুক্ত ছিলেন। কাজ থেকে ফেরার পথে ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে মারা যান তিনি।

একক কৃতিত্বে এইসব দুর্যোগ সামলে জেমস দ্বারকানাথ ও জনৈক ইহুদির সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করলেন। নীল ও রেশম নিলামে সাফল্য এনে তিনি আগের ব্যবসার দেনাশোধই কেবল করলেন না, দ্বারকানাথ এবং উইলিয়াম কারের সঙ্গে মিলিতভাবে Carr Tagore and Company গড়ে তুললেন। সেটি দ্রুত এক সওদাগরি সংস্থায় পরিণত হল। কিনে ফেললেন গার্ডেনরিচে গঙ্গাতীরের এক বিশাল হর্ম্য।

ড. উইলসনের অবসরগ্রহণের পর জেমস এশিয়াটিক সোসাইটির প্রধান হলেন। ইতোমধ্যে প্রাচীন মুদ্রা চর্চা ও ইতিহাসের উন্মোচন তাঁর নেশায় পরিণত হয়েছে। এক দশক আগে হজসনের এশিয়াটিক সোসাইটিতে পাঠানো পুঁথি এবং দিল্লির ফিরোজ শা লাট থেকে একের পর এক উদ্ধারকৃত প্রত্নতাত্ত্বিক স্মারক তাঁকে বুকাননের মতো আগ্রহী করে তুলেছে। বিহারের সারণ, তিরহুতের কেশারিয়া (বর্তমান মোতিহারির কাছে) প্রভৃতি স্থানের বৌদ্ধ নিদর্শনগুলি এইসময় আবিষ্কৃত হতে থাকে। নাগরী, বাংলা, তিব্বতি, ভোট লিপির সঙ্গে সংস্কৃত-র মিল গভীরভাবে নিরীক্ষণ করে 'শ্রমণ', 'তথাগত' প্রভৃতি শব্দ আবিষ্কার হতে থাকে।

প্রিন্সেপের এইসব গবেষণার সঙ্গে করোসির পাঠানো তিব্বতি বৌদ্ধধর্মের একশো আটটি শ্লোক, সংস্কৃত থেকে সেগুলির তিব্বতি অনুবাদ, প্রাকৃত ও পালির সম্পর্ক প্রভৃতিকে ভিত্তি করে উন্মোচিত হতে থাকেন গৌতম বুদ্ধ। ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে তিব্বতি, নেপালি, বার্মিজ, সিংহলি সব ভাষারই উৎস পালি, যেটি সিংহলে এককালে বহুল চর্চিত ও সংস্কৃত থেকে উদ্ভূত।

জেমস প্রিন্সেপের গবেষণার এই অভিমুখ নির্মাণে দুজন ইউরোপীয়র অবদানের কথা উল্লেখ করতেই হয়। এঁরা হলেন : পশ্চিম রাজস্থানের রেসিডেন্ট কর্নেল জেমস টড এবং একদা নেপোলিয়নের সৈন্যবাহিনীর ইতালীয় যোদ্ধা জেনারেল জাঁ বাপিস্তে ভেন্টুরা। ভেন্টুরা তখন রাওয়ালপিণ্ডিতে রণজিৎ সিংহের সেনাবাহিনীতে কর্মরত ছিলেন। প্রায় দু-দশক ধরে এই দুজন নানান প্রত্নতাত্ত্বিক সমীক্ষালব্ধ কয়েক হাজার গ্রিক লিপির ও নানা অজানা বর্ণখোদিত মুদ্রা, প্রস্তরখণ্ড প্রভৃতি এশিয়াটিক সোসাইটিতে পাঠিয়েছিলেন।

ভাষাচর্চার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্নতত্ত্ব, বিজ্ঞান, নৃতত্ত্ব প্রভৃতি ক্ষেত্রকে একত্রিত করে এদেশের লুপ্ত ইতিহাস উদ্ধারের ক্ষেত্রে এশিয়াটিক সোসাইটিকে এক মহৎ প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেন জেমসই।

ভারত আবিষ্কারে ইউরোপীয় প্রয়াসের জন্মদাতা ছিল এশিয়াটিক সোসাইটি। ১৭৮৪-তে উইলিয়াম (ওরিয়েন্টাল) জোনসের হাতে এটির প্রতিষ্ঠা। এর থেকেই একে একে জিওলজিক্যাল, ট্রিগোনো-মেট্রিক্যাল, আরকিওলজিক্যাল, অ্যানথ্রোপলজি-ক্যাল, জ্যুলজিক্যাল প্রভৃতি সার্ভের সৃষ্টি। মুখ্যত ভাষানির্ভর ভারতচর্চাকে বহুমুখী রূপ দেওয়ার মূল কারিগর ছিলেন জেমস প্রিন্সেপ।

১৮৩৫-এর ২৩ মে বেনারসে অবস্থানকারী আলেকজান্ডার কানিংহামকে জেমস লিখেছেন :

My dear Cunningham,

Hors de department de mes etudes!... No but I can read the Delhi No I which is of more importance; the Sanchi inscriptions have enlightened me. Each line is engraved on a separate pillar or railing than thought. They must be the gift of private individuals where names will be recorded. All end in 5L-That must mean

'gift' or given.

১৮৩৬ খ্রিস্টাব্দের শেষদিকে সন্দেহাতীতভাবে বৌদ্ধভাবনার উৎসভূমি হিসেবে ভারতবর্ষ চিহ্নিত হয়ে যায়। বুদ্ধ সম্পর্কে সকলের একমত হওয়ার সূত্র এবং উৎস হল ভাষা, শিলালিপি, জীবনচর্চা, আচরিত মন্ত্র এবং বিশ্বাস—যা সিংহল, শ্যামদেশ, ব্রহ্মদেশ, নেপাল এবং তিব্বত জুড়ে প্রতিষ্ঠিত। নক্স বা ফ্রান্সিস বুকাননের হাত ধরেই এই লুপ্ত ধর্মের আবরণ উন্মোচন অধ্যায়ের শুরু। একে চল্লিশ বছরেরও বেশি সময়ব্যাপী এক ধারাবাহিক অবিশ্বাস্য অনুসন্ধানের ফসল বলা চলে। সময়ঘটিত সামান্য এদিক ওদিক ছাড়া গৌতম, বুদ্ধ, সিদ্ধার্থ, শাক্যমুনি, শুদ্ধোদন, কপিলাবস্তু এই নামগুলিই কেবল নয়, প্রকাশিত হয় তাঁর জীবনের নানা ঘটনা : ঊনত্রিশ বছরে গৃহত্যাগ, বৈশালীর কাছে জনৈক ব্রাহ্মণের শিষ্যত্ব গ্রহণ, বিম্বিসারের কাছে রাজগৃহে সমাদর লাভ, সেখানেও উপযুক্ত গুরুলাভে ব্যর্থ হয়ে উরুবিল্ব গ্রামে ঘন অরণ্যে দু-বছর সাধনা, অবশেষে শীর্ণ শরীরে নৈরঞ্জনা নদীতে স্নানান্তে সুজাতা কর্তৃক অন্নপ্রাপ্তি। ইতোমধ্যে তাঁর পাঁচ সঙ্গী তাঁকে ছেড়ে বারাণসী যাত্রা করেন। অবশেষে এক পূর্ণিমা তিথিতে বোধিবৃক্ষতলে 'মারবিজয়' করে বোধিলাভ করেন। সিদ্ধার্থ হন তথাগত বুদ্ধ। পরবর্তী পঁয়তাল্লিশ বছর তিনি ধর্মপ্রচার করেন। এমনকী কুশীনগরে শালবৃক্ষতলে তাঁর মহাপরিনির্বাণের তথ্যও আবিষ্কৃত হয়। কেবল অনাবিষ্কৃত থাকে লুম্বিনী, শ্রাবস্তী (যেখানে সঙ্গী সহ বুদ্ধদেব প্রতিবছর বর্ষাযাপন করতেন), সাঁচির মতো স্থানগুলি।

পরবর্তী কালে জেমস প্রিন্সেপের অত্যন্ত ব্যস্ত সময় কাটে অন্য দুই কৃতী সঙ্গী হজসন ও টার্নারের সঙ্গে বার্তালাপে। এইসময় আর এক প্রত্নতাত্ত্বিক ঐতিহাসিক ফরাসি পর্যটক Jacques Stocqulier তাঁর কাজ ও চিন্তাভাবনার সঙ্গী হন।

জেমস প্রিন্সেপ

বুদ্ধের পর জেমসের জীবনের অন্যতম সেরা কীর্তি হল অশোক আবিষ্কার। এই অধ্যায়টি একটি সম্পূর্ণ পৃথক পরিচ্ছেদ দাবি করে। ১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দে পিতা জন প্রিন্সেপের মৃত্যুর পর মাকে জেমস লেখেন, ''Seventeen short years have I sojourned in this splendid Indian pilgrimage... Let me again and again return thanks for the blessings that have fallen to my lot, above all for that of content without which there can be no real happiness."

১৮৩৯ খ্রিস্টাব্দে জেমস অসুস্থ শরীরে দেশে ফিরে যান এবং মাত্র একচল্লিশ বছরে প্রয়াত হন। তাঁর মৃত্যু নিঃসন্দেহে এদেশে প্রাচ্যবিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রে এক নিদারুণ আঘাত। তাঁর প্রয়াণের সংবাদ আসার পর কলকাতা টাউন হলে সভার আয়োজন করে তাঁর স্মৃতিরক্ষার অন্যতম সেরা উপায় হিসাবে ফোর্ট উইলিয়াম সংলগ্ন কুলিঘাটে প্রিন্সেপের নামে একটি

অলঙ্কৃত স্মারক নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সম্প্রতি নবকলেবরে আলোকিত 'প্রিন্সেপ ঘাট' ভারতের ইতিহাস পুনরাবিষ্কারের অন্যতম এই কারিগরের প্রতি দেশবাসীর কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধার নিদর্শন হয়ে অবস্থান করছে।

যে-তিনজনকে নিয়ে আমাদের যাত্রা শুরু, তাঁদের মধ্যে হজসনই দীর্ঘায়ু ছিলেন। প্রায় সমগ্র কর্মজীবনই তাঁর নেপালে বুদ্ধচর্চায় কাটে। একে একে টার্নার এবং প্রিন্সেপের মৃত্যুর পর হজসন ক্রমশ অন্তর্মুখী হয়ে প্রায় ঋষির মতো জীবনযাপন করতে শুরু করেন। প্রিয়খাদ্য-পানীয়-মাংস বর্জন করে নিজেই সবজি চাষ করে সম্পূর্ণ শাকাহারী হয়ে যান। কিছুটা বদমেজাজিও হয়ে ওঠেন।

ব্রায়ান হজসন

মেকলের সর্বনাশা ভাবনার বিরুদ্ধে প্রবলভাবে রুখে দাঁড়ানো এই মানুষটি কাঠমাণ্ডু থেকে কলকাতার 'Friend of India' সংবাদপত্রে ধারাবাহিকভাবে লিখেছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন ইংরেজি শিক্ষা ও তার জ্ঞান এদেশে অবশ্যই প্রয়োজন, তবে তা কখনই এখানকার ভাষা ও সংস্কৃতিকে নষ্ট করে নয়।

১৮৩৮-৪১ সালে প্রথম আফগান যুদ্ধের ব্যর্থতার পর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি যখন দ্বিতীয়বারের সামরিক অভিযানের প্রস্তুতি নেয় তখন হজসন তার বিরোধিতা করে কর্তৃপক্ষের বিরাগভাজন হন। ফলে সিমলায় অধস্তন পদে তাঁকে নিযুক্ত করা হয় এবং তিনি ইস্তফা দেন। এদেশীয় স্ত্রীর জন্য পেনসন ও সন্তানদের জন্য ভাতার বন্দোবস্ত করে তিনি ইংল্যান্ডে ফিরে যান।

প্রায় দশ হাজারের বেশি ন্যাচারাল হিস্ট্রির সংগ্রহ, আঠারোশো স্তন্যপায়ী ও পাখির ছবি তিনি ব্রিটিশ মিউজিয়ামে দান করেছিলেন। পথে নেপাল থেকে সংগৃহীত বেশ কিছু বস্তু ফ্রান্সে পারির মিউজিয়ামে দেন।

এক বছরের মধ্যে হজসন আবার ফিরে এলেন ভারতবর্ষে। কিন্তু এবার তিনি তাঁর প্রিয় নেপালেই প্রবেশাধিকার পেলেন না। অগত্যা একাকী দার্জিলিঙে গবেষণা চালাতে থাকলেন। ১৮৫৩ সালে তিনি আবার স্বদেশে যান, অ্যানি সাউথকে বিবাহ করে দার্জিলিঙে ফিরে আসেন। অবশেষে ভগ্ন শরীরে ও মনে ১৮৫৮-তে ইংল্যান্ডে ফিরে যান; ১৮৬৮-তে বিপত্নীক হয়ে ১৮৭০ সালে বিবাহ করেন শুশান টাউন্ডসেন্ডকে। ১৮৯৪ সালে হজসনের জীবনে যবনিকা পড়ে।

হজসনের ফরাসি যোগের ফসল হল ইউজিন বার্নোর (Eugene, Burnour), ১৮৪৪ সালে প্রকাশিত Introduction l'historie du bouddhisme indien। এটিকেই ভারতীয় বুদ্ধচর্চার প্রথম সার্বিক প্রয়াস ভাবা হয়ে থাকে। বর্নো সর্বত্র কৃতজ্ঞতার সঙ্গে হজসনের ঋণ স্বীকার করে বলেছেন, হজসনই প্রথম শক্তপোক্ত ভিত্তির ওপর যথার্থ বৌদ্ধধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং তাকে কেবল ভারতবর্ষেই সীমাবদ্ধ রাখেননি, ছড়িয়ে দিয়েছেন সারা বিশ্বে।